নাটকের খোঁজে গ্রামবাংলায়

উৎপল চক্রবর্তী

তখনও চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি। মালদায় বাড়ির পাশেই এক কামারাশালায় থাকতেন এক কর্মকার। রাতে বাঁশিতে দীর্ঘক্ষণ সুর তুলতেন। মাঝে মাঝে বাঁশি থামিয়ে গান, যার মধ্যে 'মা মনসা রে' পদটি ফিরে ফিরে আসত।

'আজ রাতে কলেজ মাঠে মনসাযাত্রা হচ্ছে। যাবেন দেখতে?' দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর এমন প্রস্তাব শোনামাত্র সেই গানটির কথা মনে পড়ল এবং এবার চোখে দেখব বলে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত। সে এক অভাবিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়া। ষাট-সত্তরের কলকাতায় সুহৃদ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ঘন ঘন নাটক দেখা চোখে সে এক বিস্ময়কর নাট্যদর্শন। মঞ্চ বলতে কিছু নেই। খোলা আকাশ, নিচে মাটি চারপাশে দর্শক। হারমোনিয়াম তবলা বাঁশি বেহালা বড় কত্তাল বিষম ঢাকি নিয়ে জনকয়েক একপাশে একটা সতরঞ্চিতে। গল্পটি তো কম বেশি জানাই আছে, দেখার বিষয় হত তার উপস্থাপনা আর গানের সুর। কথা সহজ, ছন্দোময়। সুর একঘেয়েমি শূন্য তালবৈচিত্র্যে শ্রুতিসুখকর, গ্রাম্য উচ্চারণে ভিন্ন আমেজ। তবে মালদায় শোনা সেই কর্মকারের মনসাগানের সুরের সঙ্গে মিল নেই বাঁকুড়ার এই মনসার পালায়। পরে শুনেছি, ভিন্ন ধরনের সুর বাংলার পূর্ব এবং দক্ষিণ প্রান্তের মনসামঙ্গলে। আমার বিস্ময় চমকে উঠল একটি দৃশ্যে। বেহুলা ভেসে যাচ্ছে নৌকোয়। সেই মাঝখানে, দুপাশে চারজন দুটে শাড়ি এক হাত দিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে দাঁড় টানার ভঙ্গি করছে। তালে তালে এগোচ্ছে বেহুলা— অসাধারণ এক কমপোজিশন! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, যাঁরা কুশীলব তাঁরা তো তথাকথিত শিক্ষিত নন, ব্রেখট পড়েননি, কলকাতার নাটকও দেখেননি, এমন কি গ্রাম বা সদরে কালভদ্রে যে দু-একটি নাটক হয় তাও নয়, তাহলে এই রূপবন্ধ কীভাবে ওঁদের কল্পনায় এল! জাত শিল্পীর সৃজন ক্ষমতা কি তাহলে তথাকথিত 'শিক্ষা'র উপর নির্ভর করে না। আবার দেখছিলাম বাসর ঘরে সাপের শিসের আওয়াজ তুলছেন একজন বিষম ঢাকির গায়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ঘসে, অবিকাল হিস হিস শব্দ! সবাট মিলিয়ে এমন অভিভূতকারী ঘটনা যে, চাকরি সূত্রে জড়িত শিক্ষক শিক্ষণ

এই ছান্দার গ্রামে দুর্গাপুজো উপলক্ষে নাটকও অভিনীত হতে দেখলাম। 'ভাগ্যহীন পিতা', 'শয়তান', 'জানোয়ার', 'কালা শের' জাতীয় নাম; লেখক 'অগ্রদূত', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি। যাঁরা তথাকথিত নাট্যদর্শক, নাটক সংক্রান্ত খবরটবর রাখেন তাঁদের কাছে অশ্রুতপূর্ব এসব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ ধরনের নাটক কিন্তু আজও হয়ে চলেছে, মনসাপালার মতো বন্ধ হয়ে যায়নি। টিভি এক্ষেত্রে কোনও প্রভাবই ফেলেনি।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে একটু অন্যভাবে পালাটি করালাম। অন্যভাবে কারণ এই পালার কোনও পাণ্ডুলিপি তখন পাইনি। গানগুলো তুলে দিয়েছিলেন সেদিন যাঁরা পালাটি করেছিলেন তাঁদেরই একজন।

এসব সত্তরের প্রথমদিকের কথা। তখন দেখতাম পাড়ায় পাড়ায় দল গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও দল বাইরেও যাচ্ছে পালা পরিবেশন করতে। তাপপর দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও বেশি সেই গ্রামেই আছি কিন্তু আজ একটিও মনসামঙ্গলের দল নেই। একটি খাতা ছিল যাতে পালাটি লেখা ছিল সেটিও অবহেলায় কোথায় যে কার কাছে আছে কেউ জানে না। জানার আগ্রহও কারও নেই। সেবার যিনি পালাটি পরিচালনা করেছিলেন, সেই বঙ্কিম কর্মকার এখন লোকগীতি লেখেন, গান করেন, গণনাট্যের পথনাটকও করেন। মনসা যাত্রার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন, ওসব একন কে শুনবেক? টিভি রইচে না।

তাহলে দায়ী সেই নন্দ ঘোষ? অন্য কারণ নেই? ইতিমধ্যে এই ছান্দার গ্রামে দুর্গাপুজো উপলক্ষে নাটকও অভিনীত হতে দেখলাম। 'ভাগহীন পিতা', 'শয়তান', 'জানোয়ার', 'কালা শের' জাতীয় নাম; লেখক 'অগ্রদূত', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি। যাঁরা তথাকথিত নাট্যদর্শক, নাটক সংক্রান্ত খবরটবর রাখেন তাঁদের কাছে অশ্রুতপূর্ব এসব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ ধরনের নাটক কিন্তু আজও হয়ে চলেছে, মনসাপালার মতো বন্ধ হয়ে যায়নি। টিভি এক্ষেত্রে কোনও প্রবাবই ফেলেনি। কথা হল, মনসাপালা বন্ধ হল, কিন্তু এ ধরনের নাটক এখনও হচ্ছে কেন? গ্রামের মানুষের প্রবল নাট্যতৃষ্ণা থেকে? তা যদি হয়, তবে কলকাতা বা মফঃস্বলের রঙ্গমঞ্চে যে আধুনিক নাটক হচ্ছে তার থেকে এগুলো শত যোজন দূরে কেন? স্ক্রিপট পাওয়া যায় না বলে? অভিনেতা নেই বলে? মঞ্চ নির্মাণের অর্থ নেই বলে? যোগ্য পরিচালক নেই বলে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা হল প্রদীপ তুংয়ের সঙ্গে। এই ছেলেটি এমনিতে গণনাট্য করে। নাট্যপাগল। কলকাতার বিখ্যাত নাট্যবিদদের কাছ থেকে ট্রেনিংও নিয়েছে। নাট্য আকাডেমির জেলা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণও করেছে। মঞ্চসজ্জাও ভালোই করে। কিন্তু নাটকে নামায় 'শয়তান' আর 'জানোয়ার'। কেন?

প্রদীপ যা বলল তা হল এই—

১। কলকাতায় বা শহরে এখন যে ধরনের নাটক হচ্ছে তার খবর শহর ঘেঁষা গ্রামগুলো রাখে কিন্তু শহর থেকে দূরে এ বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই।

২। ও সব নাটক বোঝার মতো মানুষের সংখ্যাও তো গ্রামে বেশি নেই। যাত্রা দেখতে অভ্যস্ত, সূক্ষ্ম প্যাঁচপয়জার বা সংলাপ বোঝার মতো বোধ তৈরি হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আমার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। যোগেশ চৌধুরীর 'রাবন' করতে এসেছিলেন ওন্দা থানার এক গ্রামে। যাঁরা অজিতেশের সিনেমা দেখেছেন বা রেডিওতে নাটক শুনেছেন, তাঁদের ধারণা ছিল, রাবনের ভূমিকায় অজিতেশসুলভ অট্টহাসি শোনা যাবে। কিন্তু দর্শক অভিনেতা দুজনেরই দুর্ভাগ্য, যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' অট্টহাস্যকার ছিলেন না। ফলে কেলেংকারির একশেষ। দর্শক ক্ষেপে গিয়ে অজিতেশকে বলেন 'মঞ্জরি আমের মঞ্জরি' থেকে ডায়ালগ বলতে। চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ অবধি চেয়ার উল্টে যায়, আলো নেভে, আইনশৃঙ্খলা এবং প্যান্ডেল উভয়ই ভেঙে পড়ে।

অজিতেশ দর্শকদের একদম দোষ দেননি। বলেছিলেন, কলকাতায় আমরা আকাডেমি হলে বড় বড় বুলি কপচেছি, বিপ্লব করেছি, কিন্তু কলকাতা বা শহরের বাইরেও যে বিপুল সংখ্যক দর্শক আছেন তাঁদের কথা ভাবিনি, তাঁদের কাছে যাইনি। তাঁদের রুচিকে 'আধুনিক' করে তুলিনি ফলে গ্যাপ বা ব্যবধান তৈরি হয়েছে, হচ্ছে। সেই শূন্যস্থানে ঢুকেছে নিম্নরুচির নাটক। কার দোষে?

প্রদীপের পরের বক্তব্য—

৩। এখন যে ধরনের নাটক হয় তার মঞ্চ তৈরি করা গ্রামে অসম্ভব আলোর আয়োজন করা। অর্থ মিলবে না, উপযুক্ত প্রশিক্ষিত কর্মী মিলবে না।

৪। অভিনেতা অভিনেত্রীর সমস্যা আছে। উচ্চমানের অভিনেতা যদি বা দু-একজন থাকে, অভিনেত্রী একজনও নয়। গ্রামের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করবেন না সামাজিক বাধায়। 'ফিমেল' ভাড়া করতে হবে। তাঁরা রিহার্সালে আসবেন না। ফলে নতুন ভাবনার নাটক হওয়া অসম্ভব।

৫। নাটকের বই প্রত্যন্ত গ্রামে বসে পাওয়া সহজ নয়। অবশ্য গ্রন্থাগার আছে, সেখানে সাম্প্রতিক নাটকের অনটন। আবার গ্রামের যে কেউ নাটক লিখবেন তাও আশা করা মুশকিল। অতএব স্থানীয় বইয়ের দোকান থেকে 'শয়তান' বা 'জানোয়ার' তুলে আনা!

৬। আসলে গ্রামে নাট্যবোধ বলে বিশেষ কিছু নেই। পালাপার্বণে করা এই আর কি! সেজন্য শহরের কাছে যেখানে উন্নততর নাট্যচর্চার সুযোগ থাকে সেখানে যেতে হয়। প্রদীপ স্বয়ংই তাই যাচ্ছে মনের চাহিদা মেটাতে।

তাহলে যা দাঁড়ায়, গ্রামে লোকনাট্যের চর্চা কমেছে, আধুনিক নাটকের চর্চাও হয় না। শহরের কাছাকাছি গ্রামের ছবিটা অবশ্য একটু আলাদা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছে রাধানগর নামের গ্রামের কথা জানি সেখানে অত্যন্ত উন্নতমানের নাট্যচর্চা হয়। সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিযোগিতায় সফলতাও এসেছে। দুর্গাপুরের কাছে বড়জোড়াতেও নাট্যচর্চা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট 'মান' -এ পৌঁছতে তা সচেষ্ট। বাঁকুড়া শহরের নাট্যচর্চার ইতিহাস বেশ পুরনো কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। রাজ্য নাট্য আকাডেমি আয়োজিত নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে, এসেছে কলকাতার সুখ্যাত নাট্যদল। ফলে দর্শক তৈরি। নাট্যদলও অনেক। কিন্তু মৌলিক নাটকের চর্চা কিছু কম। অধিকাংশ সময়েই কলকাতায় অভিনীত বড় দলের নাটক মঞ্চস্থ হয় এখানে। তবে 'চরিত্র' নামে একটি গোষ্ঠী মৌলিক নাটক করে। যদিও নাটকের বিষয়বস্তু সর্বদা বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করে না। না ভাবে না ভাষায়! প্রবীণ নাট্যবিদ অনাদি বসু এখনও অক্লান্ত নাট্য পরিচালনায়, নাট্য রচনায়।

দর্শক ক্ষেপে গিয়ে অজিতেশকে বলেন 'মঞ্জরি আমের মঞ্জরি' থেকে ডায়ালগ বলতে। চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ অবধি চেয়ার উল্টে যায়, আলো নেভে, আইনশৃঙ্খলা এবং প্যান্ডেল উভয়ই ভেঙে পড়ে।

দরকচা অবস্থা

সাধারণ বাঙালি সমাজের তুলনায় বরং আদিবাসী সমাজে মৌলিক নাট্যচর্চার প্রচলন বেশি। আদিবাসী অধ্যুষিত প্রায় সব গ্রামেই নাট্যাভিনয় হয়। নাট্য প্রতিযোগিতাও হয়। এবং রাজ্য স্তরে নাটক ও অভিনয়ে পুরস্কৃত হয়েছে আদিবাসী নাট্যগোষ্ঠী, বাঁকুড়া, জেলায় এ উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু যে প্রশ্নটি মনে বারবার ওঠে, লোকনাট্যের অস্তিত্ব এখনও সপ্রাণ— বেলিয়াতোড় - রামহরিপুর সংলগ্ন নতুনগ্রাম নামের গ্রামে। সুখ্যাত নীলকণ্ঠ মুখার্জির কৃষ্ণযাত্রা অবলম্বনে বালকসঙ্গীত এখন রূপান্তরিত হয়েছে 'বালিকাসঙ্গীত' নামে। গ্রামের বাউরি সম্প্রদায়ের মেয়েরাই অভিনয় করেন, ছেলেদের চরিত্রেও। মুক্ত অঙ্গনেই অভিনয় হয়, তথাকথিত স্ক্রিপ্ট নেই। তবে খাতা আছে তাতে গান আছে। সংলাপ মুখে মুখেই তৈরি হয়। গানের গলা সকলের থাকে না বলে গাইয়ে দল থেকে। হারমোনিয়াম তবলা বাঁশি বেহালা থাকেই। আজকাল ক্যাসিও'ও চলছে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত অভিনয় করেন কুশীলবরা এবং পুরাণের সঙ্গে মিশে যায় দৈনন্দিন জীবনের আশা নিরাশা দুঃখ বেদনাও! সে ভারি উপভোগ্য পরিবেশন। রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং ধনতু বিশ্বাস, এঁরা এই লোকনাট্যটি নিয়ে কিছু কাজ করছেন ইদানীং। শ্যামাপদবাবু নাটকও লিখেছেন বালিকা সঙ্গীতের আঙ্গিকে। এই লোকনাট্যটি যে এখনও জনপ্রিয় তার প্রমাণ নতুন গ্রামের দলকে বাইরে গিয়ে গাইতে হচ্ছে প্রায় পেশাদারি প্রথায়। ধনতুবাবুরা একটি তথ্যচিত্রও তুলেছেন লোকনাট্যের এই বিশেষ আঙ্গিকটি নিয়ে। শ্যামাপদ বাবু জানালেন, এই বালিকা সঙ্গীত বাদ দিলে ওই গ্রাম বা আশপাশের গ্রামে আধুনিক নাট্যচর্চা প্রায় অনুপস্থিত।

এই সূত্রে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি জাগে, যদি লোকনাট্যের চর্চা অব্যাহতই আছে ওই গ্রামে তবে আধুনিক নাটকের চর্চা নেই কেন? ওই লোকনাট্যের স্বতঃস্ফূর্ততা নেই এই ধরনের আধুনিক নাটকে। তাই? আমাদের ঐতিহ্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বলে? বন্ধুবর সুখ্যাত নাট্যকর্মী উত্তরবাংলার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এলেন আমার কাছে নাটক বিষয়ক এক কর্মশালা উপলক্ষে। কথায় কথায় রাত কেটে যায়। জিজ্ঞাস্য ছিল, আধুনিক গান, আধুনিক সিনেমা এমনকি কিছু পরিমাণে আধুনিক সাহিত্যও গ্রামে চলে এল, প্রভাব বিস্তার করল, নাটক পারল না কেন? হরিমাধবের বক্তব্য:

১। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারণা, প্রয়োগ কৌশল, রূপায়ণ সবটাই পাশ্চাত্যের আঙ্গিক। ইংরেজি শিক্ষার গুণে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো আমরা এ ক্ষেত্রেও দেশজ নাটকের আঙ্গিককে 'গ্রাম্য' বিবেচনা করে চর্চা করেছি পাশ্চাত্য প্রকরণেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলেনি। জোর করে মেলাতে চেয়েছি। আবদ্ধ থেকেছি শহরে। গ্রামকে গ্রাহ্য করিনি চটজলদি হাততালি এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা প্রত্যাশায়।

২। কেউ কেউ লোকনাট্যের আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন বটে, সেটা আন্তরিক টানে কতটা এ বিষয়ে তর্ক আছে। অনেকটাই গিমিকের প্রয়োজনে নতুন কিছু করার কেরদানি দেখানোর জন্য।

৩। গান সিনেমা বা সাহিত্যের আধুনিক রূপ যেভাবে গ্রামে ঢুকেছে, নাটকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি মাধ্যমগত কারণেই। গ্রামে সিনেমা হল না থাক ভিডিও দেখার ব্যবস্থা আছে। টেপ রেকর্ডার বা মোবাইল ঘরে ঘরে। গান শোনার অসুবিধে নেই। গ্রন্থাগার আছে, বইও পাওয়া যায়, কিন্তু মঞ্চ নেই, আলো নেই, আধুনিক কোনও ব্যবস্থা নেই। নাটক হবে কী করে?

৪। একটি নাটকের নির্মাণ ব্যয় বহন করা গ্রামে সহজ নয়। যাতায়াতের সমস্যা ও আরও অনেক বাধা আছে। কাজেই এখনকার নাটক কীভাবে দেখবেন গ্রামের মানুষ! কীভাবে বোধ তৈরি হবে?

৫। নাট্যপন্ডিত, লোকসংস্কৃতিবিদ এবং রাজনীতিকরা লোকনাট্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে খর্ব করেছেন। দলীয় অথবা সরকারি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যকে বেছে নেবার ফলে সাধারণ দর্শকের আকর্ষণ হারিয়েছে বিষয়বস্তু! সর্বশিক্ষা, এড্‌স, মদ্যপানের কুফল, পণ্যপ্রথা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও চিত্তাকর্ষক যথার্থ শৈল্পিক নাটক লেখা যায় কিন্তু নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে ধান্দাবাজ অপটু কুশীলবদের হতে তা হয়ে ওঠে নিছক নীরস প্রচারসর্বস্ব সংলাপ! চরিত্র হারাচ্ছে গম্ভীরা, ডোমান ইত্যাদি নানা লোকনাট্য। এই সব বিষয়েও ভালো নাটক হতে পারত যদি শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা উপলব্ধি করতেন।

৬। ফলে নাটক এখন শহর নগরে যতই উচ্চমানের হোক, ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া বলা চলে না গ্রামবাংলায় তার কোনও প্রভাব পড়েছে। নাট্যবিশারদদের তাত্ত্বিক কচকচি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, গুরুগম্ভীর পত্রিকা প্রকাশ, সবটাই একপেশে, কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য, সার্বিক কোনও ব্যাপার নয়।

হরিমাধবের এসব মন্তব্যের পরেও একটি মূল সমস্যার মীমাংসা হয় না। আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আনুগত্য ইংরেজ আমল থেকে অদ্যাবধি ক্রমবর্ধমান। গ্রামে গ্রামে বোনা যে দেশের সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল গ্রাম, 'সভ্য' ইংরেজরা 'অসভ্য' এ দেশের উৎকর্ষ সাধনে সেই উৎসের

দ্বারারুদ্ধ করে শুকনো মাটিতে বপন করল পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির বীজ। কৃত্রিম জলসেচে যে ফসল ফলল, ক্রমে তাতেই মনের ভান্ডার ভরে তুলল 'শিক্ষিত' জনেরা। ফলে, রুদ্ধস্রোত গ্রামীণ সংস্কৃতি চেতনাসম্পন্ন' মানুষের কাছে তা ব্রাত্য হয়ে উঠল। যাঁরা উদারচেতা তাঁরা এই আদি সংস্কৃতিকে 'লোকসংস্কৃতি' নামে অভিহিত করলেন —লোকগান, লোককবিতা, লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকনাট্য ! হায় ! কী অসীম দয়া, কী স্নেহ, কী ভীষণ অনুকম্পা, কী শশব্যস্ত পিঠ চাপড়ানো। এই মনোভাব স্বাধীনতা লাভের পর কিছুটা পালটেছে। সেই পরিবর্তনের সূত্রে এসেছে ধান্দাবাজির সূক্ষ্ম কৌশল, আধিপত্য বিস্তারের গুঢ় অভিপ্রায়, নানাবিধ মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য হিসেবে তাকে ব্যবহার করার প্রবণতা। লোকগান, লোকশিক্ষা ভুলিয়ে যেমন 'করে খাচ্ছেন'। একদন শিল্পী, তেমনই লোকনাট্য থেকেও স্রেফ ঝেড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ। ভালোবেসে নয়, ভিন্নতর উদ্দেশ্যে, যেমনটি হরিমাধব বলেছিলেন। এই প্রক্রিয়াটিও সমর্থনযোগ্য যদি পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার চলন থাকত। তাকে লোকনাট্য এবং প্রসেনিয়াম নাটকের সমন্বয়ে হয়তো গড়ে উঠত নবধারার নাটক এবং তা যদি গ্রামেই সংঘটিত হত তাহলে নতুন এক সম্ভাবনার দরজা খুলে যেত। কিন্তু সে বোধহয় হবার নয়। পরানুকরণকারি, আত্মমর্যাদাহীন, আত্মবিস্মৃত পণ্যসংস্কৃতির শিকার এই সংস্কৃতিচর্চা কোনও একদিন যদি সম্বিত ফিরে পায়, রুদ্ধ উৎসদ্বার যদি খুলে যায়, তাহলে সংস্কৃতির কৃত্রিম বিভাজন রেখা হয়তো ধুয়ে মুছে যাবে।

দলীয় অথবা সরকারি প্রচারের মাধ্যমে হিসেবে লোকনাট্যকে বেছে নেবার ফলে সাধারণ দর্শকের আকর্ষণ হারিয়েছে বিষয়বস্তু! সর্বশিক্ষা, এড্‌স, মধ্যপানের কুফল, পণপ্রথা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও চিত্তাকর্ষক যথার্থ শৈল্পিক নাটক লেখা যায় কিন্তু নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে ধান্দাবাজ অপটু কুশীলবদের হাতে তা হয়ে ওঠে নিছক নীরস প্রচারসর্বস্ব সংলাপ!

আজ থেকে পঞ্চাশ -ষাট বছর আগে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় আমাদের গ্রাম কুসুম্বীতে বাবা-কাকাদের নাটক অভিনয় করতে দেখেছি। তখন 'বঙ্গে বর্গী', 'সিরাজদ্দৌলা','পি ডব্লু ডি', 'শাজাহান' —এ ধরনের কলকাতার মঞ্চ নাটককে গ্রামীণ রূপে দেখেছি। এখন কোনও গ্রামেই এসব হয় না। কলকাতার মঞ্চে নয়। কিন্তু এখন কলকাতার মঞ্চে যা হয় গ্রামে তা হয় কই? তবে কি আগেকার মতো কলকাতার নাটক গ্রামে তেমন ছাপ ফেলতে পারছে না! কলকাতার নাটক কি খুবই উচ্চমানের হচ্ছে যা গ্রামীণ মন ধরতে পারছে না? আগেই লিখেছি এ ধরনের প্রবণতার ব্যতিক্রম আছে কোনও কোনও গ্রামে, বিশেষত শহর ঘেঁষা গ্রামে। আধুনিক সংস্কৃতি চর্চা যতটা চুঁইয়ে পরে ততটুকুই আর কি।

তবে লিখতেই হবে, যাত্রা প্রায় প্রতিটি গ্রামে হয়। স্থায়ী দল আছে আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে দল বাঁধাও আছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্যবসা সফল নামী যাত্রা পালাগুলো কিন্তু কম বেশি গ্রামেও অভিনীত নয়— ব্রজেন দে প্রত্যন্ত গ্রামেও। এমন কি যাত্রা সূত্রে উৎপল দত্ত'ও! এবং আধুনিকতা ঢুকেছে প্রযোজনাতেও। পোশাক, লাইট, সাউন্ড, মিউজিক —কলকাতার সাধ্যমতো অনুকরণে চমক প্রদ! 'ফিমেল' -এর রমরমা। অর্থাৎ, লোকনাটকের এই আঙ্গিকটি আজও অপ্রতিহত। বিষয়টি ভারী বিচিত্র। যাত্রা অব্যাহত, অথচ মনসাপালা বিরল দর্শন। কেন? বিনোদনের উপকরণ যাত্রাতে বেশি বলে! মনসা কাহিনি বহু প্রচলিত, নতুনত্বহীন বলে। গ্রামের সৃজন প্রতিভা এই আঙ্গিককে সমসাময়িক পটভূমিতে স্থাপন করতে পারছে না। বলে! এই মনসাপালা নিয়ে কলকাতার এক পরিশীলিত দলকে গীতিনৃত্যনাট্য করতে দেখেছি! কলকাতার মঞ্চে বেশ হাততালিও জুটেছে। সেই শব্দে সচকিত হয়ে যখন গ্রামে এনেছি তাদের। গ্রামীণ দর্শক শ্রোতার কাছে তার কোনও আবেদনই পৌঁছয়নি। শৌখিন মজদুরি হলে যা হয়। এআমার চোখে দেখা ঘটনা!

অর্থাৎ, না মৌলিক নাটক না লোকআঙ্গিককে গ্রহণ করে পুরনো পালার নবরূপায়ণ, না কলকাতার অনুকরণ —শহর থেকে দূরে গ্রামবাংলায় নাটক এখন কেমন যেন দরকচা মেরে গেছে। কলকাতার বড় বড় নাট্যদল, নাট্য বিশারদবৃন্দ বাংলা নাটক নিয়ে যখন অতীব ভাবিত, নানা ক্রিয়াকান্ডে সদা ব্যস্ত, আধুনিকতম হয়ে ওঠা 'শিক্ষিত' দর্শকের স্তুতিতে গর্বিত, তখন বৃহত্তর গ্রামবাংলায় বাংলা নাটক এখনও যেন বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশে অসমর্থ, অশক্ত, সবার নিচে সবার পিছে দীন যথা ধায়...! জানি না, একালে গান সাহিত্য সিনেমা যাত্রার মতো নাটকও গ্রামে কোনওদিন 'আধুনিক' হয়ে উঠতে পারবে কি না! তার চেয়েও অজানিত, গ্রামবাংলার নাট্যচেতনা এবং নাট্যবিদদের সর্বত্র নাটককে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ কোনওদিন মিলিত হতে পারবে কিনা! অতএব 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'—আপাতত এই আপ্তবাক্যেই সান্ত্বনার অন্বেষণ এবং সেই নাট্যকারের ও নাটকের সন্ধানে নাটক - প্রিয়দের প্রতীক্ষা!